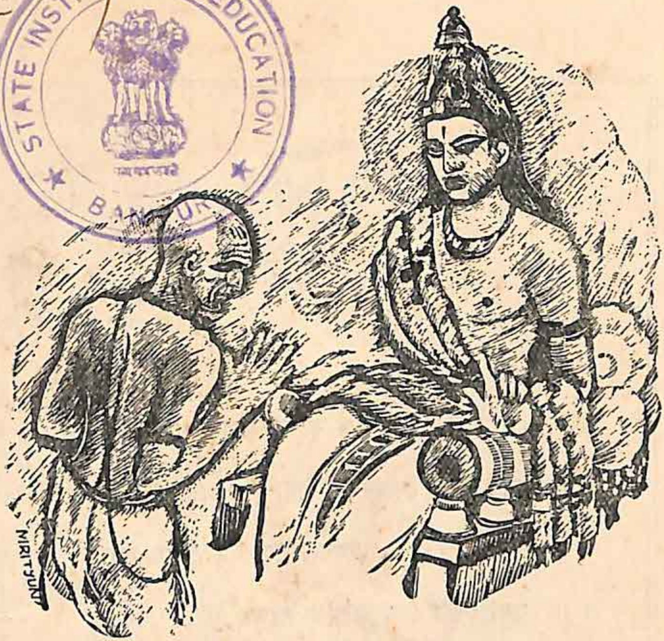


সেকালের কথা

ভোলানাথ ঘোষ



সেকালের কথা

শ্রীভোলানাথ ঘোষ, এম্‌-এ

এ. মুখার্জি এ্যাণ্ড কোং লিঃ
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

মূল্য আট আনা মাত্র।



দেবরাত

(বৈদিক যুগের গল্প)

অনেক—অনেক দিন আগের কথা, তখন অযোধ্যার রাজা ছিলেন অম্বরীষ।

পর পর কয়েক বছর সে রাজ্যে বৃষ্টি না হওয়ায় দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মুনিঋষিরা রাজাকে বললেন, 'যজ্ঞ করতে হবে—নইলে বৃষ্টি হবে না।'

রাজা অম্বরীষ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। রাজার যজ্ঞ—সে এক বিরাট ব্যাপার! দেবরাজ ইন্দ্র তো ভয়ই পেয়ে গেলেন! কি জানি, এত বড় যজ্ঞের পুণ্যফলে অম্বরীষ যদি তাঁর

ইন্দ্রত্বই কেড়ে নিয়ে যান। সেই ভয়ে যজ্ঞের যেটি প্রধান বলি, সেই পশুটিকে তিনি চুরি ক'রে নিয়ে পালালেন।

এদিকে যজ্ঞের সময় এসে গেল। দেখা গেল, যজ্ঞের প্রধান পশুটি নেই। রাজা অম্বরীষ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। কি করা যায় ?

রাজ-পুরোহিত বললেন, 'মহারাজ, যজ্ঞের জন্য উৎসর্গ-করা পশু পাওয়া না গেলে বড়ই অমঙ্গল হবে। যেমন ক'রে হোক, পশুটি খুঁজে বা'র করতেই হবে।'

পুরোহিতের কথা শুনে রাজার চোখে আর ঘুম নেই। একদিন তিনি পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদি পশুটি পাওয়া না যায়—তাহলে কি উপায় হবে ?'

পুরোহিত বললেন, 'তাহলে ঐ পশুর বদলে কোন একটি ছোটো ছেলেকে বলি দিতে হবে। কিন্তু কারও কাছ থেকে জোর ক'রে নিয়ে এলে, সে বলি সফল হবে না। যদি ছেলেটির বাবা মা তাকে আপনার কাছে বিক্রি করেন এবং ছেলেটির যদি কোনো আপত্তি না থাকে—তবেই আপনার যজ্ঞ সফল হবে।'

রাজা চারদিকে লোক পাঠালেন। তারা অনেক খুঁজেও পশুটিকে পেল না। শেষে রাজা একটি ছোটো ছেলের সন্ধানে নিজেই বেরিয়ে পড়লেন। কারণ, যজ্ঞ সফল না হলে তাঁর রাজ্য একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে যে!

দিনের পর দিন যায়। রাজা কতো ছেলের বাবা মার কাছে গেলেন—রাজা তাদের প্রচুর ধন-রত্ন, গাভী দান করতে চাইলেন, কিন্তু নিজের ছেলেকে বিক্রি করতে—বলির জন্য বিক্রি করতে কেউ চায় কি ? ফলে কেউ রাজি হলো না। অবশেষে ঘুরতে

ঘুরতে রাজা একদিন ভৃগুশৃঙ্গ পর্বতে ঋচীক মুনির আশ্রমে এসে পৌঁছলেন। ঋচীকের কাছে অম্বরীষ সব কথা খুলে বললেন।

এই ঋচীক ছিলেন বিশ্বামিত্রের ভগ্নীপতি। তিনি রাজার কথা শুনে খুব দুঃখ পেলেন। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, আমার তিন পুত্রের একজনকে আপনার কাছে বিক্রি করতে পারি। আপনি ভাববেন না যে, আমি অর্থের লোভে একাজ করছি। রাজ্যের বিপদ জেনে—তার ভালোর জন্যই আমি আমার ছেলেকে বিক্রি করতে রাজি হয়েছি। তবে বড় ছেলেকে বাদ দিয়ে বাকি দুইজনের মধ্যে একজনকে দেবো।'

ঋচীক-পত্নী সত্যবতী স্বামীর কাছে সব শুনে বললেন, 'আমি আমার ছোটো ছেলেকে দেব না।'



ঋচীকের মধ্যম পুত্র শুনঃশেফ বলল, 'মহারাজ, আমি স্বেচ্ছায় আপনার সঙ্গে যেতে রাজি আছি।'

এমনি ভাবে যখন তাঁদের মধ্যে কথা হচ্ছে তখন ঋচীকের মধ্যমপুত্র শুনঃশেফ বলল, 'মহারাজ, আমি স্বেচ্ছায় আপনার সঙ্গে যেতে রাজি আছি। আমার এই জীবন দিলে—যদি রাজ্যরক্ষা হয়,—তাহলে তার চেয়ে আনন্দের কথা আর কি আছে? আপনি আমাকে নিয়ে চলুন।'

শুনঃশেফের কথা শুনে সবার চোখে জল এল, একটি ছোট্ট ছেলে—অথচ এমন নির্ভীক—এমন সরল! কিন্তু উপায় নেই। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য অম্বরীষ শুনঃশেফকে গ্রহণ করলেন। তিনি ঋচীককে দিলেন একহাজার দুগ্ধবতী গাভী এবং অনেক ধনরত্ন।

শুনঃশেফকে নিয়ে ফিরবার সময় রাজা অম্বরীষ কিছুকাল বিশ্রামের জন্য পুষ্কর তীর্থে এলেন। সেখানে তখন বিশ্বামিত্র তপস্যা করছিলেন। সম্পর্কে তিনি শুনঃশেফের মামা। শুনঃশেফ তার মামাকে সব কিছু বলল। শেষে খুব অনুনয় ক'রে তাঁকে বলল, 'আচ্ছা মাতুল, আপনি কি এমন একটা কিছু করতে পারেন না—যাতে যজ্ঞ নষ্ট হবে না অথচ আমার প্রাণও রক্ষা পায়?'

বিশ্বামিত্র তখনই তাঁর ছেলেদের ডেকে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ শুনঃশেফের হয়ে প্রাণ দান কর।'

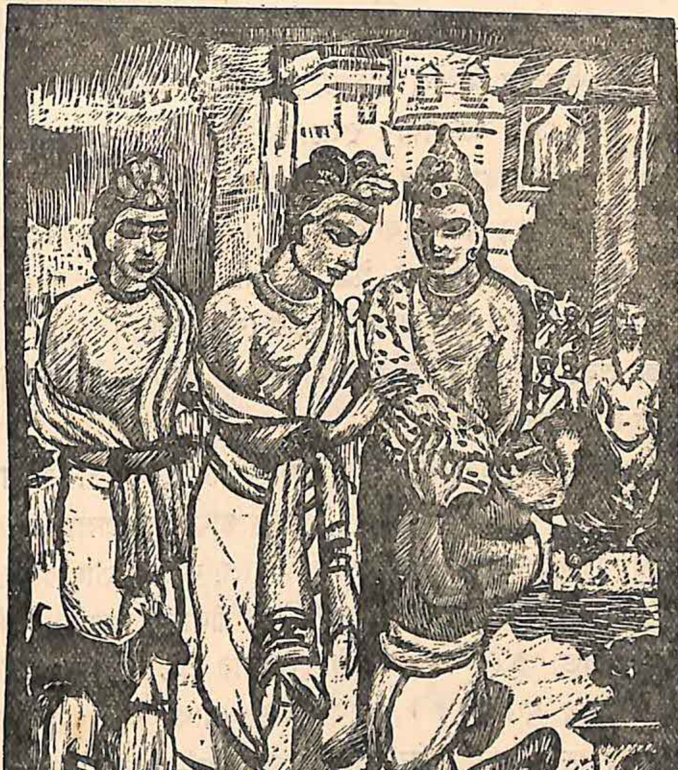
তারা কেউ রাজি হলো না। বিশ্বামিত্র ছেলেদের অভিশাপ দিলেন।

পরে তিনি শুনঃশেফকে বললেন—'বৎস, তুমি ভয় পেওনা—আমি তোমাকে দু'টি ঋক্‌মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি। যখন তোমাকে বলি দিতে যাবে তখন তুমি সেই মন্ত্র উচ্চারণ কোরো। তাহলে স্বয়ং ইন্দ্র ও অগ্নি তোমাকে রক্ষা করবেন। যজ্ঞও হবে—তুমিও রক্ষা পাবে। তুমি নির্ভয়ে যাও, বৎস! যতকাল পৃথিবীতে মানুষ বেঁচে থাকবে, তোমার এই স্বেচ্ছায় প্রাণদানের কাহিনী ততদিন ঘোষিত হবে।'

এই বলে বিশ্বামিত্র তাকে ঋক্‌মন্ত্র দু'টি শিখিয়ে দিলেন।

অম্বরীষ শুনঃশেফকে সঙ্গে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন। রাজ্যে সবাই যেন আবার প্রাণ ফিরে পেল!

শুনঃশেফের বলির দিন আসন্ন। দিনরাত সে ঋক্‌মন্ত্র দু'টি



শুনঃশেফ তার ছোটো ছোটো হাত দু'টি জোড় ক'রে বিশ্বামিত্রের শেখানো ঋক্‌মন্ত্র আবৃত্তি করলেন—পৃঃ ৬।

আবৃত্তি ক'রে দেবতার কাছে প্রার্থনা জানায়। যথা সময়ে তাকে স্নান করিয়ে—ফুলের মালা পরিয়ে যজ্ঞ-ভূমিতে নিয়ে যাওয়া হলো। যূপকাষ্ঠে বাঁধা হলো তাকে। সম্মুখে যজ্ঞ-বেদীতে লেলিহান হোমের আগুন। ঘাতক খড়্গ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আদেশ পেলেই শুনঃশেফকে বলি দেবে। পুরোহিত উচ্চকণ্ঠে মন্ত্রপাঠ করছেন। অম্বরীষ আকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন শুনঃশেফের দিকে। চোখে তাঁর অশ্রুধারা। শুনঃশেফ তার ছোটো ছোটো হাত দু'টি জোড় ক'রে বিশ্বামিত্রের শেখানো ঋক্‌মন্ত্র আবৃত্তি করলেন। ঠিক সেই সময় যজ্ঞভূমিতে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। সবাই বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে, স্বয়ং ইন্দ্র ও অগ্নিদেব যজ্ঞস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন—আর ইন্দ্রের সঙ্গে রয়েছে যজ্ঞের সেই হারানো পশুটি!

ইন্দ্র শুনঃশেফের বাঁধন খুলে দিলেন। আর সেই জায়গায় পশুটিকে রাখলেন বেঁধে।

শুনঃশেফকে বুকে জড়িয়ে ধরে ইন্দ্র বললেন, 'বৎস, আমার জন্য তুমি প্রাণ হারাতে বসেছিলে। কিন্তু মানুষের কল্যাণে যে ভাবে তুমি নিজের প্রাণ বলি দিতে গিয়েছিলে, তাতে তোমার মহৎ প্রাণের পরিচয় দিয়েছো। আমি আশীর্বাদ করছি—তুমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে যশস্বী হও। তোমার এই আত্ম-উৎসর্গের কাহিনী অমর হয়ে থাক্। আর আজ থেকে আমি তোমার নাম দিলাম দেবরাত।' 'দেবরাত' শব্দের অর্থ—দেবতার দান। এর পরে তিনি অম্বরীষকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'মহারাজ, শুনঃশেফের পুণ্যবলে তোমার যজ্ঞ সার্থক হবে।'

এই বলে ইন্দ্র ও অগ্নিদেব সকলকে আশীর্বাদ ক'রে রাজসভা ছেড়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

বিশ্বামিত্র যজ্ঞভূমি থেকে দেবরাতকে পুত্ররূপে গ্রহণ ক'রে নিজের আশ্রমে নিয়ে গেলেন। বিশ্বামিত্রের ঋক্‌মন্ত্রে সব দিক রক্ষা পেল।

যজ্ঞের ফলে রাজা অম্বরীষের রাজ্যে আর কোনো দুঃখ-কষ্ট রইল না। সে বছর প্রচুর বৃষ্টি হলো। নোতুন ফসলও দেখা দিল। সেই থেকে আজও লোকে শুনঃশেফের কাহিনী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।





সিদ্ধার্থ ও দেবদত্ত

(বৌদ্ধ যুগের কথা)

সে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। হিমালয় পর্বতের কাছাকাছি কপিলাবস্তু নগরে শুদ্ধোদন নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর একটি মাত্র ছেলে ছিল। ছেলেটির নাম সিদ্ধার্থ। এই সিদ্ধার্থই একদিন সংসার ত্যাগ ক'রে বহুকাল তপস্যা করেন এবং তপস্যায় সিদ্ধি লাভ ক'রে ভগবান বুদ্ধ হিসাবে পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁরই ছোট বেলার একটি কাহিনী বলছি।

সিদ্ধার্থ একদিন বাগানে বসে আছেন,—এমন সময় একটি উড়ন্ত হাঁস ঘুরে ঘুরে তাঁর সামনে এসে পড়ল। সিদ্ধার্থ হাঁসটিকে তুলে নিয়ে দেখলেন—তার বুকে একটা তীর বিঁধে আছে। পাখীটিকে ব্যথায় ছটফট করতে দেখে তাঁর খুব দুঃখ হলো। তিনি ধীরে ধীরে তীরটা হাঁসের বুক থেকে তুলে ফেললেন। তীরটা যেখানে বিঁধেছিল, সেখান থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছিল। সিদ্ধার্থ সেই আঘাতের জায়গাটি ধুয়ে সেখানে ওষুধ লাগিয়ে দিলেন।

হাঁসের বুক থেকে তীরটা খোলার সময় সিদ্ধার্থের হাত কেটে গেল। হাতের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তিনি ভাবলেন—'আমার হাতে একটু লাগতেই এত জ্বালা করছে—আর এই পাখীটির বুক চিরে গেছে তীরের ফলায়। না জানি, কতো ব্যথাই সে পেয়েছে!' এই ভেবে তাঁর চোখে জল এল।

এদিকে সিদ্ধার্থের মামাতো ভাই কি যেন খুঁজতে খুঁজতে সেই বাগানে এসে পড়লেন। সিদ্ধার্থের হাতে হাঁসটি দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, 'একি! এ যে আমার হাঁস! আমি একে তীরবিদ্ধ করেছি—আমার হাঁস আমাকে দাও।'

সিদ্ধার্থ বললেন, 'এ তাহলে তোমার কাজ! এ তোমার কি নিষ্ঠুর খেলা ভাই! তোমার যেমন প্রাণ আছে—এই ছোটো পাখীটিরও তেমনই প্রাণ আছে। তাকে আঘাত ক'রে তোমার কি লাভ হলো ভাই?'

সিদ্ধার্থের কথায় দেবদত্ত চটে গেলেন। তিনি রেগে বললেন, 'এখন উপদেশ রাখো। আমার হাঁস আমাকে দাও। আমি ক্ষত্রিয়ের ছেলে। তোমার মতো অত দুর্বল-প্রাণ আমার নয়। ক্ষত্রিয়ের ছেলের অত দুর্বল-প্রাণ হওয়া সাজে না।'

সিদ্ধার্থ বললেন, 'তবে কি ক্ষত্রিয়ের ছেলেকে শুধু নিষ্ঠুরই হতে হবে? তার প্রাণে কি দয়া-মায়া থাকবে না ভাই?



সিদ্ধার্থ বললেন, 'এ হাঁস আমি তোমাকে দেব না।'

যাহোক্, এই হাঁস আমি তোমাকে দেব না। যে প্রাণী হত্যা করে—সে সেই প্রাণীর মালিক বটে, আমি তা অস্বীকার

করিনে। কিন্তু এটাও মনে রেখো—যে তাকে বাঁচায়, তারও অধিকার কম নয়। আমি এই হাঁসটিকে বাঁচিয়ে তুলেছি। কাজেই এ হাঁসে আমার অধিকারই বেশী—এখন আর তোমার কোন অধিকার নেই।'

দেবদত্ত বললেন, 'আমিই পাখীটিকে তীর ছুঁড়ে আকাশ থেকে নামিয়েছি। ওটা আমাকে দিতেই হবে।' পরে ঠাট্টা ক'রে বললেন, 'একদিন তুমি রাজা হবে। তখন এই দুর্বল মন নিয়ে কি ক'রে যে তুমি রাজত্ব করবে! দাও হাঁসটি।'

সিদ্ধার্থ বললেন, 'আমি আমার রাজ্যের অধিকার তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। এই রাজ্য তুমি নিয়ে নাও। কিন্তু এ হাঁস আমি তোমাকে দেব না।'

সিদ্ধার্থের কথা শুনে দেবদত্ত অবাক্ হয়ে গেলেন। একটি হাঁসের জন্য রাজ্যের অধিকার ছেড়ে দেওয়া! এ যে অসম্ভব!

সিদ্ধার্থ আদর ক'রে হাঁসটির গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন। ছোটো পাখীটি মনের আনন্দে আবার আকাশ-পথে উড়ে চলে গেল। দেবদত্ত মাথা হেঁট ক'রে ফিরে গেলেন।

সামান্য জীবকেও যে কতোখানি ভালোবাসতে হয়—সিদ্ধার্থ তা বাল্যকাল থেকেই শিখেছিলেন।

জটার কুটা বা কুহক জাতক



(বৌদ্ধ জাতক)

মহারাজ ব্রহ্মদত্ত যখন কাশীর রাজা, তখন মগধের একটি গ্রামে এক জমিদার ছিলেন। সাধু-সন্ন্যাসীর উপর তাঁর খুব ভক্তি ছিল। গেরুয়া-পরা কোনো সাধু দেখলেই হলো—অমনি তাঁর পায়ে পড়ে যান! কে ভালো কে মন্দ, এ নিয়ে বিচার করার কোনো অবকাশই তিনি পেতেন না। পথ থেকে সাধু-সন্ন্যাসী ধরে এনে দু'বেলা পরিপাটি ক'রে খাইয়ে-দাইয়ে তাঁদের সেবা করতেন। তাঁর বিশ্বাস, সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা করলে খুব পুণ্য হয়।

একদিন জমিদার এক সন্ন্যাসীকে ধরে এনে বাড়ীতে রাখলেন। সন্ন্যাসী তো জমিদারের সেবার ঘটা দেখে আর তাঁর বাড়ী ছাড়তে চান না। জমিদার আর কি করেন? তিনি তাঁর

বাগানে সন্ন্যাসীর বাসের জন্য ঘর ক'রে দিলেন। তাঁর ভোগের জন্য জমিদার-বাড়ী থেকে দু'বেলা খাবার আসে। তার পরিমাণও এত বেশী যে, অল্প দিনের মধ্যে সন্ন্যাসী বেশ নাদুস-নুদুস হয়ে উঠলেন।

কিছুদিন পর সেই গ্রামে চোরের বড়ই উপদ্রব দেখা দিল। জমিদারের চোখে তো আর ঘুম নেই। এত ধনরত্ন এখন কোথায় রাখেন? চোর-ডাকাতের ভয়ে সারারাত তাঁকে জেগে থাকতে হয়। আর ভেবে ভেবে তিনি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিলেন। হঠাৎ একদিন মনে হলো, 'আচ্ছা, এই সন্ন্যাসী তো শুধু বসে বসে খাচ্ছেন—তাঁকে যদি ধনরত্ন রক্ষার ভার দেওয়া যায় তো মন্দ হয় না। কেউ বুঝতে পারবে না যে সন্ন্যাসীর কাছে ধনরত্ন আছে।'

এই ভেবে সন্ন্যাসী যে ঘরে বাস করতেন—জমিদার সেই ঘরেই মাটির তলায় সব ধনরত্ন লুকিয়ে রাখলেন। জমিদার ভাবলেন, 'বাঁচা গেল! ভাগ্যিস এই সন্ন্যাসী ঠাকুর এসে পড়েছিলেন!'

এই ভাবে পরম শান্তিতে বেশ কিছু দিন কেটে যায়। এদিকে সন্ন্যাসী ঠাকুর কিছুদিন থেকে খাওয়া কমিয়ে ফেললেন। আর তিনি দুধ, ঘি, মিষ্টি কিছুই খেতে চান না। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'আমি সন্ন্যাসী মানুষ—আমার এত খাওয়ার লোভ থাকা ভালো নয়। তোমরা পাছে মনে ব্যথা পাও, এই ভয়ে এতদিন তবু ভোগ-সুখেই কাটিয়েছি, রাজভোগে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু আমাদের পক্ষে এরকম ভোজন করা উচিত নয়, আর সংসারের মধ্যে বাস করাও আমাদের পক্ষে শোভা পায় না। অথচ তোমার ভক্তিতে মুগ্ধ হয়েই পড়ে আছি। যাহোক, ভগবানের ইচ্ছায়

তোমার অনেক উন্নতি হয়েছে। এবার আমাকে আমার ব্রত পালন করতে দাও।' এই বলে তিনি সেদিন থেকে কেবল একবেলা সামান্য কিছু ফলমূল খাওয়া শুরু করলেন।

জমিদার ভাবলেন, 'আহা, যথার্থই সন্ন্যাসী বটে!' কাজেই সেই দিন হতে তাঁর সেবা-যত্ন আরও দশগুণ বেড়ে গেল।

সন্ন্যাসী দিন-রাত সাধন-ভজন নিয়েই মেতে থাকেন। কেউ কিছু দিলে ফেরত দেন—বলেন, 'আমি সন্ন্যাসী, এতো সব দিয়ে কি করবো?'

একদিন জমিদার ও তাঁর স্ত্রী এসে সন্ন্যাসীর পায়ে পড়ে বললেন, 'আমাদের দু'জনকে দীক্ষা দিয়ে এই দুঃখের সংসার থেকে মুক্তি দিন।'

সন্ন্যাসী গম্ভীর ভাবে বললেন, 'এখনও তোমাদের দীক্ষার সময় হয়নি।'

অনেক কান্নাকাটি ধরাধরি করায় সন্ন্যাসী অবশেষে তাঁদের দু'জনকে দীক্ষা দিলেন। তাঁরা অসংখ্য মূল্যবান্ জিনিসপত্র সন্ন্যাসীকে গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ দিয়ে তাঁকে আ-ভূমি প্রণাম জানালেন। কিন্তু সন্ন্যাসী ঐসব মূল্যবান্ জিনিসপত্রের কিছুই গ্রহণ করলেন না। শুধু একটি মাত্র হরিতকী তুলে নিয়ে জমিদার ও তাঁর স্ত্রীকে আশীর্বাদ করলেন।

এ ভাবে আরও কিছুদিন কেটে গেল। একদিন সন্ন্যাসী জমিদারকে ডেকে বললেন, 'বৎস, সন্ন্যাসীদের এক জায়গায় বেশী দিন থাকা উচিত নয়। আমি সিদ্ধিলাভ করেছি বলে কিছুদিন তোমাদের এখানে রয়ে গেলুম। এইবার আমি তীর্থ দর্শন করতে যাব। তোমরা আমাকে আর বাধা দিও না।'

জমিদার সন্ন্যাসীর পা দু'টি জড়িয়ে ধরে বললেন, 'সে কি কথা বাবা! আপনি না থাকলে যে আমরা চোখে অন্ধকার দেখব! আপনার পায়ে পড়ি—আপনি যাবেন না।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'সে হয় না বৎস, আমায় এমন ক'রে মায়ায় বেঁধ না। সন্ন্যাস-ধর্মবিরুদ্ধ কোনো কাজ আমি করতে পারব না। তোমরা ভেব না, আমি আবার তোমাদের দেখা দেব। এখন ধৈর্য ধরে থাকো।'

জমিদার নিতান্ত অনিচ্ছায় চুপ ক'রে রইলেন।

সন্ন্যাসীর যাবার দিন ঘনিয়ে এল। জমিদার তাঁর পায়ে অনেক ধনরত্ন ঢেলে দিলেন—কিন্তু সন্ন্যাসী কিছুই গ্রহণ করলেন না। এ রকম নিরাসক্তি দেখে সবাই অবাক্ হয়ে গেল। জমিদার-বাড়ীর সবাই অনেকদূর পর্যন্ত সন্ন্যাসীকে এগিয়ে দিলেন।

জমিদার যখন ফিরে আসছেন তখন হঠাৎ পেছন থেকে সন্ন্যাসী ডেকে বললেন, 'বৎস, এই খড়টি নিয়ে যাও। আমি আসবার সময় আমার জটায় বেধে এই খড় চলে এসেছে। সামান্য খড় হলেও সন্ন্যাসীর তা নেওয়া উচিত নয়।'

জমিদার আবার চোখের জলে তাঁর পা দু'খানি ভিজিয়ে দিলেন। মনে মনে ভাবেন, 'আহা, কি অনাসক্তি! এমন গুরু না হলে কি ভগবানের আশীর্বাদ পাওয়া যায়!'

ফেরার পথে এক সওদাগরের সঙ্গে জমিদারের দেখা। সওদাগর তখন নিজের দোকানে বসে আর একজন সওদাগরের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। এই দ্বিতীয় সওদাগর আর কেউ নন—ইনি হচ্ছেন বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধদেব। সেজন্মে বোধিসত্ত্ব সওদাগর হয়ে জন্মেছিলেন।

জমিদারের পরিচিত সওদাগরটি তাঁকে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি খালি পায়ে কোথায় গিয়েছিলেন ?'

জমিদার চোখের জল ফেলে একে একে তাঁর গুরুর গুণ-গান করলেন। গুরুর ধন-দৌলতে অনাসক্তির কথা বারবার বলে কাঁদতে লাগলেন।

বোধিসত্ত্ব চুপ ক'রে সব শুনছিলেন। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি সন্ন্যাসী ঠাকুরের ঝোলাঝুলি ভালো ক'রে দেখেছেন তো ?'

জমিদার তো চটেই আগুন। বলে কি ? গুরুর ঝোলাঝুলি দেখা !

বোধিসত্ত্বের সেদিকে খেয়াল নেই। তিনি মুচকি হেসে আবার বললেন, 'সন্ন্যাসীর আস্তানাটা একবার ভালো ক'রে দেখুন ত সব ঠিক আছে কিনা।'

জমিদার এবার আর সামলাতে পারলেন না,—রেগে চীৎকার ক'রে বললেন,—'মশায়, আপনার কি মাথা খারাপ ? আপনি কি সাধু-সন্ন্যাসীর সম্মান রেখে কথা কইতে জানেন না ? আমি বার বার বলছি তিনি আমার গুরু—আপনি তবুও যা-তা বলছেন!'

বোধিসত্ত্ব হেসে বললেন, 'আমি তা' অস্বীকার করছি না। শুধু বলছি যে, তিনি যে ঘরে থাকতেন—সে ঘরখানা একবার দেখা উচিত। ওঁর বেশী অনাসক্তিতে আমার বড়ই সন্দেহ হচ্ছে।'

জমিদার দেখলেন এরকম লোকের সঙ্গে কথা বলাও পাপ। বোধিসত্ত্বের কথার কোনো উত্তর না দিয়েই তিনি বাড়ী ফিরে এলেন। বাড়ী ফিরেই বাগানে সন্ন্যাসীর ঘরে প্রবেশ করলেন। কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে গিয়ে দেখেন—সর্বনাশ, মাটি যে

এমনিতেই উঠে আসছে! ভয়ে তাঁর বুক কাঁপতে লাগল। তবে কি ওই নোতুন সওদাগরের কথা—না না, তা কি ক'রে হবে? তিনি যে গুরু!



ওই সন্ন্যাসীর ঘরে ধনরত্ন যা' রেখেছিলুম—তার কিছুই নেই—পৃঃ ১৮।

মাটি খুঁড়ে কলসীগুলো তুলে দেখেন—সবই খালি। ধনরত্ন যা' ছিল তার কিছুই নেই।

জমিদার ছুটে গেলেন সওদাগরের দোকানে। হাউ মাউ ক'রে কেঁদে বললেন, 'আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে—আপনার কথাই সত্যি হলো! ওই সন্ন্যাসীর ঘরে ধনরত্ন যা' রেখেছিলুম—তার কিছুই নেই। এখন কি করি?—আমার উপায় কি হবে?'

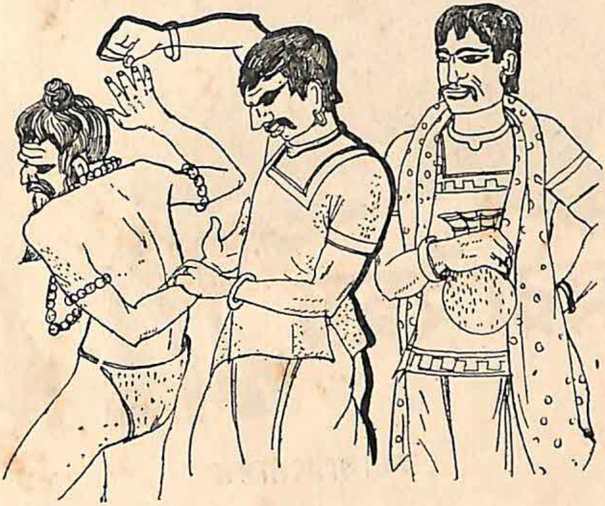
সওদাগর তো চোখ ছানাবড়া ক'রে বসে রইলেন। বোধিসত্ত্ব বললেন, 'শীগ্‌গির দুটো ঘোড়া জোগাড় করুন।'

বোধিসত্ত্ব ও জমিদার ঘোড়ায় ক'রে ছুটলেন কিন্তু তিন চার মাইলের মধ্যেও সন্ন্যাসীকে দেখতে পেলেন না।

আরও কিছুদূর গিয়ে মাঠের একধারে তাঁরা একটা ভাঙা বাড়ী দেখতে পেলেন। তার আশে পাশে কোনো মানুষই দেখা যায় না। কেবল শেয়ালের গান ছাড়া সেখানে আর কিছুই শোনা যায় না। বোধিসত্ত্ব জমিদারকে নিয়ে সেই ভাঙা বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলেন। কাছে গিয়ে জমিদার যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষু স্থির! দেখেন তাঁর গুরু বসে বসে চিমটে দিয়ে মাটি খুঁড়ছেন!

বোধিসত্ত্ব গিয়ে সন্ন্যাসীকে ধ'রে ফেললেন। এদিকে সে জায়গায় জমিদার মাটি খুঁড়ে দেখেন—তাঁরই সব ধনরত্ন সেখানে পোঁতা আছে! তখন আর ব্যাপারখানা বুঝতে কারো বাকি রইলো না যে, প্রত্যহ সন্ন্যাসী যখন রাত্রিবেলা বের হ'তেন—তখন এই সব ধনরত্ন চুপি চুপি সরিয়ে ফেলতেন। আজ যাবার সময় তা নিয়ে পালাতে গিয়ে বোধিসত্ত্বের কাছে ধরা পড়ে গেলেন। জমিদার তখন বুঝলেন গুরু তাঁর কতো বড়ো কীর্তিমান্ সন্ন্যাসী!

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'এখন বুঝতে পারছেন কেন আমি আপনার গুরুর অতিরিক্ত অনাসক্তিতে সন্দেহ করেছিলুম।'



জমিদার আর কোনো উত্তর দিলেন না। সন্ন্যাসীর পিঠে কিছু ধনরত্ন দমাদম্‌ পড়ল। জমিদার বোধিসত্ত্বের সঙ্গে ধনরত্ন নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন।



মরা ইঁদুর

(কথাসরিৎসাগর)

কাজ করার ইচ্ছে থাকলে মানুষ সবই করতে পারে। আর যারা কাজ ফাঁকি দিতে চায় তারা জীবনে কিছুই করতে পারে না।

কথাটা ভালো ক'রে বোঝাবার জন্য একটা গল্প বলছি।

অনেকদিন আগে মথুরায় এক বণিক ছিলেন। বিয়ের দেড় বছরের মধ্যেই তিনি মারা যান। তাঁর স্ত্রীর তখন সন্তান হওয়ার অল্প কয়েকদিন বাকি। এরই মধ্যে স্বামী মারা যাওয়াতে বণিক-পত্নী বড়ই বিপদে পড়লেন। তার ওপর আত্মীয়-স্বজনরা বণিকের বিষয়-সম্পত্তি ভাগ-বাঁটরা ক'রে নিয়ে নিল। তাঁর স্ত্রী কিছুই পেলেন না।

কিছুদিন পর বণিক-পত্নীর একটি ছেলে হ'ল। মা আদর ক'রে তার নাম রাখলেন মণিদত্ত। হতভাগা ছেলে জীবনে আর তার বাপকে দেখতেই পেল না।

দরিদ্র বিধবা বহু কষ্টে ছেলেকে প্রতিপালন করেন। কিন্তু না পারেন তাকে ভালো ক'রে লেখাপড়া শেখাতে, না পারেন তাকে ভালো ক'রে খাওয়াতে। কাজেই বিনা পয়সায় যতটুকু লেখাপড়া শেখানো যায় ততটুকুই সে শিখল।

ধীরে ধীরে ছেলেটি বড়ো হয়ে ওঠে। একদিন মা তাকে বললেন, 'বাবা, এবার তুমি রোজগার করার চেষ্টা কর। নইলে আর তো কোনো উপায় নেই। না খেয়ে ক'দিন আর বাঁচবো? তুমি শহরে যাও—সেখানে একজন খুব বড়ো ধনী সওদাগর আছেন। তিনি অনেক সময় বিনা সুদে টাকা ধার দেন। কিছু টাকা ধার নিয়ে ব্যবসার চেষ্টা করো বাবা।'

পুত্র মণিদত্ত মাকে প্রণাম ক'রে শহরের পথে রওনা হ'ল। শহরে পৌঁছে সওদাগরের বাড়ী চিনতে তার বিশেষ কোনো কষ্ট হ'ল না, সে সোজা তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

সওদাগরের বাড়ী গিয়ে দেখে—তিনি একজন লোককে তখন খুব বকাবকি করছেন। সেই লোকটিকে তিনি তখন বলছিলেন, 'তুমি আবার ব্যবসা করবে কি ছাই! সব টাকা তো নষ্ট করেছো। যার কাজ করার ইচ্ছে আছে—সে, ওই যে মরা ইঁদুরটি প'ড়ে আছে, তা দিয়েও টাকা রোজগার করতে পারে। কোন মূলধন আর তার দরকার হয় না। যাহোক্, আমি তোমাকে আর এক পয়সাও দেব না। তুমি চলে যাও—আমার এখানে আর কিছু হবে না।'

বকাবকি শুনে মণিদত্তের আর টাকা চাইতে সাহস হ'ল না, শুধু মরা ইঁদুরটা তুলে নিয়ে সে সওদাগরকে বলল, 'আমি এই



মণিদত্ত সওদাগরকে বলল, 'আমি এই মরা ইঁদুরটা নিয়ে যাচ্ছি। আমার নাম আপনার খাতায় লিখে রাখুন। টাকা হাতে এলেই এ দেনা শোধ ক'রে দিয়ে যাবো।'

মরা ইঁদুরটা নিয়ে যাচ্ছি। আমার নাম আপনার খাতায় লিখে রাখুন। টাকা হাতে এলেই এ দেনা শোধ ক'রে দিয়ে যাবো।'

সওদাগর তো হেসেই খুন! ছেলেটা বোকা নাকি! যাহোক্, মণিদত্ত মরা ইঁদুরটা নিয়েই পথে বেরিয়ে পড়ল।

একটি লোক তার বাড়ীতে বিড়াল পুষত। সে মণিদত্তের হাতে ইঁদুরটা দেখে কিছু ছাতু দিয়ে সে'টি কিনে নিল।

মণিদত্ত সেই ছাতু ও এক ঘড়া জল নিয়ে কাঠুরিয়াদের চল্‌তি পথে বসে রইলো। তারপর পরিশ্রান্ত কাঠুরিয়াদের তা' খাইয়ে তার বদলে কিছু কাঠ লাভ করলো। কেউবা পয়সা কড়িও কিছু কিছু দিয়ে গেল। মণিদত্ত সেই কাঠ বিক্রি ক'রে আবার ছাতু কিনে এনে তাদের খাওয়াতো। এভাবে সে কিছু কাঠ বিক্রি ক'রে পয়সা রোজগার ক'রে, আর কিছু কাঠ সে জমা ক'রে রাখে দুর্দিনের জন্য।

শীঘ্রই বর্ষা এসে গেল। শুক্‌নো কাঠের দাম তখন বেড়ে গেল চতুর্গুণ। মণিদত্ত তখন বেশী দামে তার জমানো কাঠ বিক্রি ক'রে অনেক টাকা লাভ করলো। এ ভাবে ব্যবসা করতে করতে সে অবশেষে এক কাঠের ব্যবসাই শুরু করল। সেই কাঠের ব্যবসা থেকেও কিছু টাকা জমিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুতোরের কাজও শুরু ক'রে দিল। কাজের কোথাও তার এতটুকু অবহেলা নেই।

কাজেই কিছুদিনের মধ্যেই মণিদত্তের বেশ পয়সা হ'ল। তার ও তার মা'র আর কোনো দুঃখ রইল না। এখন তার বড়ো বাড়ী—বড়ো দোকান। তবু সে একদিনের জন্যও ভুলতে পারেনি যে, সে সওদাগরের ধার শোধ দেবে বলে এসেছে।

একদিন মণিদত্ত সওদাগরের কাছে একটি সোনার ইঁদুর গড়িয়ে পাঠিয়ে দিলে - এবং সেই সঙ্গে লিখে পাঠালে—'আপনার

কাছ থেকে যে ইঁদুরটা একদিন ধার নিয়েছিলাম আজ তা পাঠিয়ে দিলাম।'



সওদাগর মণিদত্তের সাধুতা ও পরিশ্রমের জন্য খুব খুশী হলেন। তিনি এর পর প্রস্তাব করলেন যে, মণিদত্তের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন।

শুধু প্রস্তাবই নয়, কাজেও তা' হয়ে গেল একদিন। সওদাগর ঘটা ক'রে মণিদত্তের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিলেন।

মরা ইঁদুরের জন্য তার এত ধন-দৌলত হয়েছিল, তাই মণিদত্তের আর এক নাম হ'ল মূষক। মণিদত্তের ও তার মা'র সমস্ত দুঃখ-কষ্ট চিরদিনের জন্য ঘুচে গেল।



স্বাধীন জীবন

(ঈশপের গল্প)

এক ভদ্রলোকের খুব বড়ো একটা কুকুর ছিল। একদিন তিনি কুকুটাকে নিয়ে বনের ধারে বেড়াতে গেলেন। কুকুরটা এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে বনের মধ্যে প্রবেশ করল। সেখানে হঠাৎ এক বাঘের সঙ্গে তার দেখা। বাঘটি দেখতে তেমন বড়ো নয়—আর না খেতে পেয়ে যেন রোগা হয়ে পড়েছে।

বাঘ ওরকম বিরাট কুকুর দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে হে? এখানে তো কোনো দিন তোমাকে দেখিনি।'

কুকুর বলল, 'আমি এক ধনী লোকের বাড়ীর কুকুর। সেখানেই থাকি। কাজেই না দেখারই কথা।'

বাঘ বলল, 'অনেক কুকুরই দেখেছি—কিন্তু তোমার মতো এমন বিরাট কুকুর তো দেখিনি!'

কুকুর বলল, 'আমি কি আর পথে পথে ঘুরে বেড়াই? বড়োলোকের বাড়ীতে থাকি—আরামে ভালো খাওয়া-দাওয়া করি—প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে স্নান করা, চাকর-বাকরদের সেবা পাওয়া সে এক বিরাট ব্যাপার! আমার মুনিব আমাকে খুব আদর করেন। আচ্ছা, তুমি বাঘ হয়ে তোমার এ দশা কেন? হাড়গোড় সব বেরিয়ে গেছে, ব্যাপার কি?'

বাঘ দুঃখ ক'রে বলল, 'আর বল কেন ভাই, বনে থাকি—প্রত্যেক দিন খাওয়াও জোটে না। যেদিন জোটে—সেদিন খাই, না পেলে উপোস থাকতে হয়। আর এই বনে থাকা—কখনও শীত—কখনও গরম। এত দুঃখ-কষ্টে আর কি ক'রে ভালো থাকি বল!'

বাঘের কথা শুনে কুকুরের দয়া হ'ল, সে বাঘকে বলল, 'তোমার কথা শুনে বড়ই দুঃখ পেলাম। তুমি না হয় আমার সঙ্গে চল। আমার মুনিবকে বলে তোমার একটা ব্যবস্থা ক'রে দেব। সেখানে খাওয়া-দাওয়া ভালোই পাবে।'

বাঘ খুশী হয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই যাবো, কিন্তু বল তো আমায় কি করতে হবে?'

কুকুর বলল, 'তেমন কিছু নয়, রাত্তিরে চোর-ডাকাত যাতে ঢুকতে না পারে, সেদিকে নজর রাখতে হবে।'

বাঘ খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'ও সব আমার ধাতে বেশ সইবে।'

কুকুর তখন বাঘকে নিয়ে তার মুনিবের কাছে চলল। কিছুদূর চলার পর হঠাৎ বাঘের লক্ষ্য হ'ল কুকুরের গলায়

কিসের একটা দাগ ! সে কুকুরকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা ভাই, তোমার গলায় ও কিসের দাগ ?'

কুকুর বলল, 'ওঃ। ঐ দাগের কথা বলছ। ও ভাই বিশেষ কিছু নয়, দিনের বেলায় পাছে কোথাও চলে যাই—তার জন্য শেকল দিয়ে আমায় বেঁধে রাখা হয়। রাত্রিবেলায় আবার ওরা ছেড়ে দেয়।'

বাঘ অবাক্ হয়ে বলল, 'বল কি হে? তুমি কি তাহলে ইচ্ছা মতো বেড়াতে পারো না ?'

কুকুর বলল, 'বাড়ীতে ঘুরে বেড়াই।'

বাঘ তখন আঁ্যাৎকে উঠে বলল, 'না ভাই, আর যাই বল না কেন—ঐ শেকল গলায় পরতে পারবো না, আমি বনের পশু—বনে ফিরে যাওয়াই আমার পক্ষে ভালো। বড়োলোকের কাছে ভালো খেয়ে আর কাজ নেই। বনে না খেয়ে মরলেও আমি স্বাধীন। তুমি এত পেয়েও পরাধীন, তোমার জীবনের চাইতে আমার স্বাধীন জীবন অনেক ভালো।'





(রাজ তরঙ্গিনী)

প্রাচীন কালের বিখ্যাত রাজা বিক্রমাদিত্য। তাঁর রাজধানী ছিল উজ্জয়িনীতে। বিক্রমাদিত্যের সম্বন্ধে কতো গল্পই না রয়েছে। তারই একটা গল্প আজ বলছি।

বিক্রমাদিত্য গুণীর আদর করতেন। কালিদাস, বরাহমিহির প্রভৃতি তাঁর সভা আলোকিত ক'রে বসে থাকতেন। তাঁর অনুগ্রহে কারও অভাব ছিল না।

এই সব গুণীদের এক পাশে থাকতেন পণ্ডিত মাতৃগুপ্ত। অন্যেরা কতো কথাই না বলে! কিন্তু মাতৃগুপ্ত একেবারে চুপ

ক'রে বসে থাকেন। তিনি নিঃশব্দে রাজার কাজ ক'রে যেতেন। কারও সঙ্গে কোনো কথা বলা বা তর্ক করা তাঁর স্বভাব ছিল না।

তাঁর সঙ্গে বিক্রমাদিত্যের ব্যবহারে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যেত। তিনি সবাইকে আদর-যত্ন করেন—কিন্তু মাতৃগুপ্তের দিকে ফিরেও তাকান না; উল্‌টো অনাদর, অবহেলাই বেশী করতেন। তবুও মাতৃগুপ্তের মুখে একটি কথাও নেই।

বিক্রমাদিত্য সব কাজের ভার মাতৃগুপ্তের উপরই দিতেন। সবাই তাঁকে ঠাট্টা ক'রে বলত, 'মুখ বুজে বসে থাকলে এখানে কিছু জুটবে না। তার চাইতে ভালো ক'রে রাজার নামে কয়েকটা শ্লোক লেখ। তাহলে দুবেলা খেতে পরতে পাবে। নইলে আর দুঃখের শেষ হবে না।'

মাতৃগুপ্ত তাদের কথার জবাব দেন না। নিজের কাজ নিজেই ক'রে যান, কবে যে তাঁর এ দুঃখের শেষ হবে, একমাত্র বিধাতাই জানেন। দেখতে দেখতে দেড় বছর কেটে গেল।

কিছুদিন পর খবর এল কাশ্মীরের রাজার মৃত্যু ঘটেছে। সেখানকার অমাত্যরা বিক্রমাদিত্যের কাছে খবর পাঠালেন—'দয়া ক'রে একজন প্রজাবৎসল রাজা পাঠান।'

কাশ্মীর তখন বিক্রমাদিত্যের অধীনে ছিল।

রাজা মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন। মাতৃগুপ্ত রাজার মুখের অবস্থা দেখে খুব দুঃখিত হলেন। কি জানি কি বিপদ ঘটেছে তাঁর! তিনি রাজার আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন।

বিক্রমাদিত্য কিছুক্ষণ পর মাতৃগুপ্তের মুখের পানে তাকিয়ে দেখলেন। মাতৃগুপ্তের দেহের অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয়।

না খেতে পেয়ে শরীরের অবস্থা এমন হয়েছে যে, হাড়গুলি সব গোণা যায়। বিক্রমাদিত্য মাতৃগুপ্তকে কাছে ডেকে বললেন, 'মাতৃগুপ্ত, আজ তোমাকে আমার একটা কঠিন কাজ ক'রে দিতে হবে। পারবে তো?'

মাতৃগুপ্ত বললেন, 'আদেশ করুন, মহারাজ!'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'আমি তোমায় একখানা পত্র দেব। তুমি সেখানি নিয়ে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রীকে দেবে। এই তোমার কাজ।'

মাতৃগুপ্ত বললেন, 'মহারাজ, আপনার আদেশ শিরোধার্য। আপনি পত্রখানা দিন মহারাজ, আমি এখনই যাত্রা করছি।'

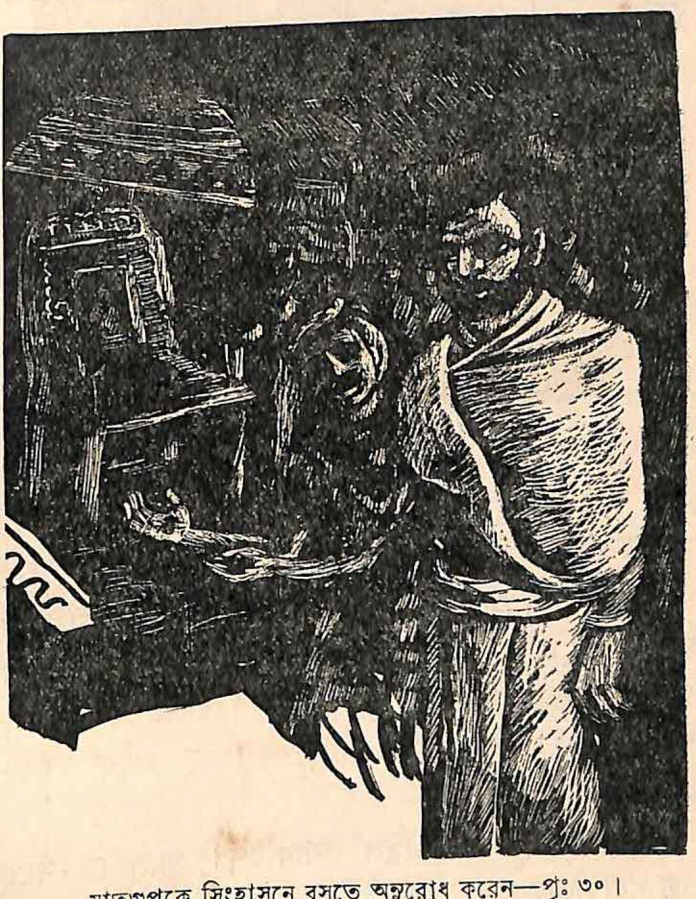
রাজা পত্রখানি লিখে মাতৃগুপ্তের হাতে দিলেন। কিন্তু মাতৃগুপ্তের শরীর তখন ভেঙ্গে পড়েছে। তাঁর আর এমন শক্তি নেই যে, পথ চলতে পারেন। তার ওপর উজ্জয়িনী থেকে কাশ্মীর দূরও অনেকটা। তবুও রাজার আদেশ—এই কথা মনে রেখে তিনি দীর্ঘপথ পেরিয়ে কাশ্মীরে এসে পেঁাছলেন। কাশ্মীরে পৌঁছেই তিনি মহারাজের পত্রখানি প্রধানমন্ত্রীর হাতে দিলেন। কিন্তু এ কি! মন্ত্রী পত্রখানি পড়েই মাতৃগুপ্তকে প্রণাম ক'রে সিংহাসনে বসতে অনুরোধ করেন।

মাতৃগুপ্ত কিছুই বুঝতে পারলেন না। মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার মন্ত্রী, আমায় এ উপহাস কেন?'

প্রধানমন্ত্রী তাঁকে বিক্রমাদিত্যের পত্রখানি পড়তে দিলেন। তাতে লেখা ছিল—

'পত্রবাহক মাতৃগুপ্ত জ্ঞানী, গুণী, সহিষ্ণু ও ধীর। এ রকম পণ্ডিত ও নম্র ব্যক্তি আমার সভায় আর একজনও নাই। দুঃখকে

তিনি সহজ ভাবেই স্বীকার ক'রে নিতে পারেন। আমি অনেক পরীক্ষা ক'রে দেখেছি—তাঁর কোনো ত্রুটি ধরতে পারিনি। ইনিই কাশ্মীরের সিংহাসনে বসবার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি।'



মাতৃগুপ্তকে সিংহাসনে বসতে অনুরোধ করেন—পৃঃ ৩০।

রাজার মহানুভবতায়, আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় মাতৃগুপ্তের চোখে জল ভরে এল।



(গ্রীক উপকথা)

প্রাচীন কালে হারকিউলিস ছিলেন এক মস্ত বড়ো বীর। সারা দুনিয়ার মানুষ যখন দৈত্য, দানব, রাক্ষস, হিংস্র পশুর ভয়ে অস্থির হয়ে ছিল, একমাত্র হারকিউলিসই ছিলেন তখন তাদের আশা-ভরসা। তখন তিনিই তাদের বিপদ্ থেকে উদ্ধার করতেন।

হারকিউলিসের শক্তি ছিল অসাধারণ। আজ সে সম্বন্ধে একটি গল্প বলছি।

রাজা ইউরিস্‌থিউসের দেশ। মস্ত বড়ো রাজা। কিন্তু দেশে কোনো শান্তি নেই। তাঁর দেশের কাছাকাছি সমুদ্রে একটি

ভয়ানক বিষাক্ত সাপ বাস করত। সাপটির মাথা ছিল নয়টি। সাধারণ বড়ো সাপের চেয়ে সে ছিল প্রায় দশগুণ লম্বা। আর সে এত ভীষণ প্রকৃতির ছিল যে, কেউ সমুদ্রের কাছে গেলেই সে তেড়ে এসে তাকে ছোবল মেরে তুলে নিয়ে যেতো। তার বিষও এত মারাত্মক ছিল যে, মুহূর্ত মধ্যে মানুষের মৃত্যু ঘটত। আর শুধু মানুষ কেন, কোনো প্রাণীই তার সঙ্গে এঁটে উঠ্‌তে পারতো না। এই সাপটির নাম ছিল 'হাইড্রা'।

হাইড্রার ভয়ে সেদেশে কারও চোখে ঘুম নেই। সবাই ভাবে কেমন ক'রে এই ভীষণ যমের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। স্বর্গের দেবতারাও তার ভয়ে অস্থির। উদ্ধত হাইড্রা কাউকেই ভয় পায় না।

রাজা কতো বীর, কতো সৈন্য-সামন্ত পাঠালেন তাকে মারতে। কিন্তু কেউ আর ফিরে আসে না। দেশও প্রায় বীর-শূন্য হয়ে এলো!

অবশেষে রাজা একদিন ডেকে পাঠালেন হারকিউলিসকে। খবর পেয়ে হারকিউলিস, রাজা ইউরিস্‌থিউসের রাজসভায় উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখলে মনে হয়, যেন প্রকাণ্ড পাহাড় মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে! হাত দু'খানি যেন বিরাট এক বটগাছের গুঁড়ির মতো!

রাজাকে অভিবাদন ক'রে হারকিউলিস বললেন,—'মহারাজ, আপনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন কেন?'

ইউরিস্‌থিউস বললেন, 'হে অজেয় বীর হারকিউলিস, আজ সমস্ত দেশ ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে আছে। আপনাকে এ ভয় থেকে তাদের বাঁচাতে হবে।'

হারকিউলিস বললেন, 'আমাকে কি করতে হবে আদেশ করুন।'

রাজা বললেন, 'সমুদ্রে একটা ভয়ঙ্কর বিষধর ও বীভৎস সাপ দেখা দিয়েছে। মানুষ মারাই তার একমাত্র কাজ। সমস্ত পৃথিবীকে সে বিপন্ন ক'রে তুলেছে। এই সাপটির নাম হাইড্রা। তার নয়টা মাথা। প্রত্যেকটি মাথা থেকে যেন আগুন ঠিক্‌রে বেরোয়! তাছাড়া আরো এক অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এই সাপ মরেও মরে না। তার একটি মাথা কাটা গেলে তক্ষুণি সেখানে আবার আরও দুটো মাথা গজিয়ে ওঠে। কতো বীর এই সাপের মুখে প্রাণ দিয়েছে, তার আর হিসেব নেই। আপনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর। এই ভয়ানক সাপটাকে বধ ক'রে পৃথিবীকে রক্ষা করুন। অস্ত্র-শস্ত্র, সৈন্য-সামন্ত, ধন-দৌলত—আপনার যা দরকার হয়, তাই-ই দেব। আপনি ছাড়া এই সাপকে আর কেউ বধ করতে পারবে না।'

হারকিউলিস বললেন, 'বেশ, এই হাইড্রাকে আমি বধ করব। আমার বেশী কিছু দরকার নেই। শুধু একটি গদা থাকবে—আর সঙ্গে থাকবে আমার একমাত্র সহচর—আইওলস্।'

রাজা হারকিউলিসকে উপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে বিদায় দিলেন।

হারকিউলিস একটি মস্ত বড়ো ভারী গদা হাতে নিয়ে চললেন—হাইড্রাকে বধ করতে। সঙ্গে রইলেন তাঁর সহচর আইওলস্।

সমুদ্রের জলের কাছে এসে পৌঁছলেন—হারকিউলিস। চারদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি—যাতে হঠাৎ হাইড্রা তাঁকে আক্রমণ

করতে না পারে। শত্রুবধের সংকল্প তাঁকে যেন আরও শক্তিশালী ক'রে তুলেছে। এমন সময় জলের ভেতর থেকে হাইড্রা মুখ তুলল। দূর থেকে দেখতে পেল হারকিউলিসকে, তার নয়টা মাথার চোখগুলো যেন দপ দপ ক'রে জ্বলে উঠল। হারকিউলিসও তাকে দেখতে পেলেন। তিনি দু'হাতে গদা ধরে তৈরী হয়ে রইলেন। তাঁর কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন আইওলস্।

হাইড্রা উষ্ণ নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ছুটে এলো হারকিউলিসের দিকে। নাক দিয়ে তার ধোঁয়া বেরুচ্ছে। প্রচণ্ড বেগে সে আক্রমণ করল হারকিউলিসকে। হারকিউলিস তৎক্ষণাৎ তাকে গদা দিয়ে আঘাত করলেন।

লড়াই শুরু হ'ল। একদিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠবীর হারকিউলিস—অপর দিকে পৃথিবীর আতঙ্ক, ভয়ঙ্কর হাইড্রা।

গদার এক এক আঘাতে হারকিউলিস সাপের এক একটি মাথা ছিঁড়ে ফেলেন। কিন্তু অমনি সেই জায়গায় দুটো ক'রে মাথা গজিয়ে ওঠে। লড়াই আর শেষ হয় না। সমুদ্রের তীরে সে কি প্রচণ্ড গর্জন। একদিকে সাপের অগ্নিস্রাবী নিঃশ্বাস, আর অন্য দিকে বীর হারকিউলিসের গগনভেদী হুংকার! সমস্ত বেলাভূমি কেঁপে ওঠে প্রতিটি মুহূর্তে!

দিন শেষ হয়ে আসে—কিন্তু লড়াই আর শেষ হয় না। সাপটাও বুঝেছে যে, সে আজ শক্ত মানুষের পাল্লায় পড়েছে।

হারকিউলিসের দেহে ক্লান্তি নেমে আসে। শেষ পর্যন্ত কি একটা সাপের কাছে হারকিউলিসের সমস্ত শক্তি ব্যর্থ হয়ে যাবে?

কিন্তু হারকিউলিস একবারও ক্লান্তির ভাব দেখান না। শত্রুর কাছে দুর্বলতা প্রকাশ করা—সে কি সম্ভব ? কিন্তু তবু হারকিউলিসের মনে হতাশা জেগে ওঠে। তাঁর মনে হয়, এ ভাবে আর কতক্ষণ চলবে ?

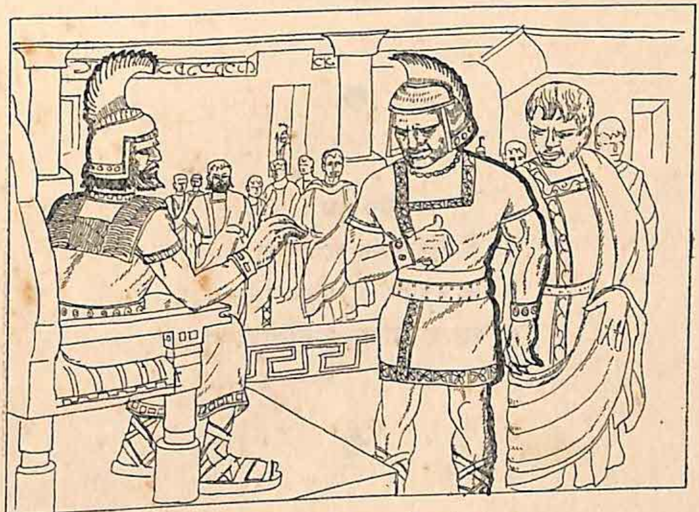
আইওলস্‌কে হারকিউলিস কি যেন ইঙ্গিত করলেন। আইওলস্ মশাল হাতে এগিয়ে এল। এবার হারকিউলিস ভীষণ তেজে শেষবারের মতো আক্রমণ করলেন ভয়ঙ্কর হাইড্রাকে। গদার আঘাতে একটি ক'রে মাথা ছিঁড়ে ফেলেন, আর আইওলস্, হাইড্রার সেই জায়গা তক্ষুণি পুড়িয়ে দেন তাঁর মশালের আগুনে। কাজেই হাইড্রার ঘাড় থেকে আর মাথা বেরোয় না। এমনি ক'রে পর পর নয়টা মাথাই থেৎলে চুরমার ক'রে দিলেন হারকিউলিস—আর আইওলস্ সাপের সেই ঘাড়ের অংশটা আগুন দিয়ে ঝলসে পুড়িয়ে দেন।

অবশেষে হাইড্রার মৃত্যু ঘনিয়ে এল। বিরাট দৈত্যের মতো সেই ভয়ঙ্কর সাপ মরে পড়ে রইল সেই সমুদ্রের ধারে।

সূর্য তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে। দেশের লোকেরা খবর পেল হারকিউলিস, হাইড্রাকে বধ করেছেন। মহা উল্লাসে সবাই হারকিউলিসের জয়ধ্বনি ক'রে ওঠে। দেবতারা আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করলেন। পৃথিবীতে আবার শান্তি ফিরে এল।

রাজা ইউরিস্‌থিউস, হারকিউলিসকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'হে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর, আপনাকে আমার অদেয় কিছুই নেই। আপনি কি চান বলুন—আমি তাই আপনাকে দেব।'

হারকিউলিস বললেন, 'মহারাজ! হাইড্রার মৃত্যুতে পৃথিবীতে যে শান্তি ফিরে এসেছে, তাই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আমি আর কিছুই চাইনে।'



'আপনি কি চান বলুন।'—পৃঃ ৩৬।

সবাই 'ধন্য ধন্য' ক'রে উঠল। স্বর্গের দেবতারা তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। পৃথিবীর সকল মানুষের ভয় ঘুচিয়ে হারকিউলিস আবার নিজের দেশে ফিরে গেলেন।

প্রথম প্রকাশ,
সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫।

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
এ. মুখার্জি এ্যাণ্ড কোং লিঃ
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২।

মুদ্রাকর :
শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস লিঃ
২৫, ডি, এল্, রায় ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

ঃ গণশিক্ষা গ্রন্থমালা ঃ

পাটের কথা

ধানের কথা

পুরাণ কাহিনী

কাজের কথা

টাকাকড়ির কথা

॥ প্রতি খণ্ড ছয় আনা অথবা আট আনা ॥

* * *

বয়স্ক-শিক্ষার উপযোগী আরও কয়েকখানি সুলিখিত পুস্তক

আমাদের দেশ	(ইতিহাস)	॥৵০
মরেও যারা রইল বেঁচে	(স্মরণীয় জীবনী)	॥৵০
জগতের ধর্মগুরু	(খ্রীষ্ট-বুদ্ধ-মোহাম্মদ-চৈতন্য-নানক)	১।০
সত্যের সন্ধানে	(চিত্রে গান্ধী-জীবনী)	২॥০
সুভাষ-আলেখ্য	(চিত্রে নেতাজী-জীবনী)	২॥০
দধীচির অস্থি	(চিত্রে বাঙলার ইতিহাস)	১৲
বিশ্বের দরবারে বাঙালী		১।০
একশ'টি বাংলা গান		১॥০

এ, মুখার্জ্জী অ্যাণ্ড কোং লিঃ
॥ কলিকাতা—১২ ॥